রামকৃষ্ণদেবের ‘কথা’

বিশ্বজিৎ রায়

শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাকে অমৃত জ্ঞান করেছিলেন। সবার সে-উপলব্ধি হয় না—যাঁর হয় তাঁর হয়। তবে রামকৃষ্ণদেবের কথা যে ‘অন্যরকম’ তা সেকালের কলকাতা বুঝেছিল, প্রথমে মেনে নেয়নি, ক্রমে ক্রমে মেনে নিয়েছিল। তিনি থাকতেন কলকাতার উপকণ্ঠে। তখন কলকাতা তার চারপাশকে গিলে খেতে শুরু করেনি। শ্রীম তাঁর কথামৃতকে ঠাকুরের অবস্থা ও ভাবের ‘কয়েকখানি মাত্র চিত্র’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন—প্রথম সংস্করণে সব ছবি অবশ্য আঁকা হয়নি। পরবর্তী সংস্করণে আরও আরও শব্দছবি যোগ হল। কথামৃতের ষষ্ঠ সংস্করণের উপক্রমণিকায় শ্রীম লিখেছিলেন, ‘‘ঠাকুরের চিত্র ছাড়া আরো কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল যথা—রাসমণির কালীবাড়ির প্ল্যান, মন্দিরের দৃশ্য—প্রাঙ্গণে ও ভাগীরথীবক্ষে...।’’ ঠাকুর যে-স্থানে থাকেন সে-জায়গাটি কলকাতা নয়, কলকাতার সঙ্গে সে-জায়গার নানা অমিল। সে-গ্রাম দক্ষিণেশ্বর। শ্রীম স্থানটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করছেন। ঠাকুরের কথা শুনতে কলকাতা সেখানে আসছে আবার ঠাকুরও মাঝে মাঝে কথা বলতে-শুনতে-দেখতে কলকাতা যাচ্ছেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর কথা বিনিময় হচ্ছে। কলকাতার ‘কথা’ বলার ভঙ্গি আর ঠাকুরের ‘কথা’ বলার ভঙ্গি এক নয়। দুই কথার রকম আলাদা, দুই কথার ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলাদা। কথামৃতজ্ঞানে যাঁরা ঠাকুরের বাগ্‌ধারা পান করেন তাঁরা বুঁদ হয়ে থাকেন। তাঁদের থাক আলাদা। তাঁর কথার আর একদল রসিক আছেন, তাঁরা আবার অন্য থাকের মানুষ। তাঁরা বিচার করতে বসেন দুই কথার ইতিহাস ও সংস্কৃতির বৈপরীত্য—বাক্‌সংস্কৃতির এই ইতিহাস বিচারের সূত্রেও পড়া যেতে পারে শ্রীম-র ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’।

কলকাতার মানুষ রামকৃষ্ণদেবকে প্রথমে কী চোখে দেখত, সেকথা জানিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান’ বইতে। মহেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষদর্শী, তাই তাঁর বিবরণের গুরুত্ব অপরিসীম। লিখেছিলেন তিনি :

‘‘খুব স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম লোকটি পাঁড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত; মাঝে মাঝে অসভ্য ভাষায় কথা কহিতেছে। কিন্তু লোকটি পাগলও নয়, যে নিতান্ত এলোমেলো ভাব। আফিমখোরের ভাবও নয় যে নিঝুম হইয়া আছে।... আবার যে বালকের ভাব, সেরকমও তো নয়; কারণ ছোট

ছেলেদের ভিতর নিরবচ্ছিন্নতার, অর্থাৎ Continuance-এর ভাবটি থাকে না।... আবার যে সাধারণ লোক, তাহাও তো দেখিতেছি না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন যে লোক—নানা বিষয়ে বেশ পরামর্শ দিতে পারে, তাহাও তো দেখিতেছি না। তর্ক, যুক্তি ও নানা রকম দার্শনিক মত, যাহা আমরা সর্বদা শুনিতাম, এ ব্যক্তি তো সেরকম কিছু কথা বলিতেছে না। দেখিলাম লোকটি হড়বড় করিয়াও কথা বলিতেছে না বা যাহাকে বলে 'প্রগল্‌ভ' তাহাও তো নাই! কলিকাতায় যেমন বক্তৃতা শুনিতাম, বক্তা অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছে, এ লোকটি তো তেমনও কিছু বলিতেছে না। পণ্ডিতগিরি ফলানো বা গুরুগিরি করাও তো নাই।... লোকটি যেন তাহার মনটিকে উচ্চস্তর হইতে নামাইয়া আনিয়া কথা কহিতেছে; আর না হইলে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।" (নিম্নরেখা সংযোজিত)

লক্ষণীয়, মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই অংশে রামকৃষ্ণদেবকে 'লোকটি' বলে সম্বোধন করেছেন। রামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ হয়ে বিচারবিহীন-ভাবে প্রথমেই তাঁকে মান্যতা দিচ্ছেন না। কলকাতাও প্রথমে রামকৃষ্ণদেবকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায়নি। তাছাড়া রামকৃষ্ণদেবের ভাষা, যাকে 'অসভ্য ভাষা' বলেছেন এখানে, মহেন্দ্রনাথ তাকে অন্যত্র, 'কথাবার্তার ভাষা কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ভাষার মতো নয়, অতি গ্রাম্য ভাষা, এমনকী, কলিকাতা শহরের রুচি বিগর্হিত' বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বিবরণে অন্যত্র এও জানা গেছে, রামকৃষ্ণদেবের বাগ্‌ভঙ্গি 'তোতলার মতো'—'ন'-এর জায়গায় অনেক সময় 'ল' উচ্চারণ করেন। রামকৃষ্ণদেবের বাগ্‌ভঙ্গি ও উচ্চারণের প্রতি অবজ্ঞা অবশ্য ক্রমে কেটে গেছে। মহেন্দ্রনাথ নেতি নেতি করতে করতে ইতিতে এগিয়েছেন। বাক্‌সংস্কৃতির যে-জনপ্রিয় বর্গগুলি কলকাতার সামাজিকতায় তখন বিশিষ্ট ছিল সেই বাগ্‌বৈশিষ্ট্য কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে নেই। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পরামর্শ, দার্শনিকের তর্ক, প্রগল্‌ভতা, গুরুগিরি, বক্তৃতাবাজি এসবের রকমের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের কথার রকম একেবারেই মেলে না। ঠাকুরের কথা অন্য মার্গের, তাই শেষ অবধি মহেন্দ্রনাথের বক্তব্য, মনটি উচ্চস্তরে রাখা—সেখান থেকে নামিয়ে এনে কথা বলছেন, আর মাঝে মাঝে উপলব্ধির নীরবতায় ডুবে যাচ্ছেন। রামকৃষ্ণদেবের 'কথা'-র প্রকৃতিকে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করলেন মহেন্দ্রনাথ। বোঝা যাচ্ছে কথার এই অশ্রুতপূর্ব রকম ক্রমশ তাঁর মনোহরণ করেছে। শুধু মহেন্দ্রনাথেরই নয়, কলকাতার অনেক মানুষেরই ঠাকুরের কথায় মনের বদল ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁরা ঠাট্টা করে গ্রেট গুজ (great goose) বলতেন, রামচন্দ্র দত্ত রামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াত করতেন। আত্মীয় সুরেশ মিত্রকে (সুরেন্দ্রনাথ মিত্র) তিনি পরমহংসের কথা বলেন। চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে সুরেশ তাঁকে বলেছিলেন, ''তোমার গুরু, পরমহংস যদি আমার কথার উত্তর দিতে পারে, তবে ভাল, নইলে তার কান মলে দিয়ে আসবো।" মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণ থেকে জানা যায় সুরেশ ''খানিকক্ষণ কথাবার্তা কহিবার পর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন...।" (নিম্নরেখা সংযোজিত) এই যে কলকাতার শিক্ষিত মানুষকে কথার নিজস্ব ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমশ তাঁর কাছে টেনে নিলেন এ এক অর্থে পাশ্চাত্যের হাতফেরতা বাক্‌সংস্কৃতির পরাভব।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন' সাময়িকী। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা 'উদ্দীপনা'। উদ্দীপনা বলতে অক্ষয়চন্দ্র এলোকোয়েন্স-কে (eloquence) বুঝিয়েছিলেন। তাঁর অভিমত, আমাদের স্বদেশে

অনেক কিছু ছিল, কিন্তু প্রাচীন রোমান সভ্যতার মতো আমাদের দেশে এলোকোয়েন্স ছিল না। এই এলোকোয়েন্স বা উদ্দীপনা অনুশীলনের গুরুত্ব নির্দেশ করেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল ডেভিড হিউমের নিবন্ধ 'Of Eloquence'। এই নিবন্ধে হিউম ডিমস্থিনিস ও সিসেরোর যে-বাগ্মিতার জগৎ তার কথা লিখেছিলেন। ইংরেজি এলোকোয়েন্স শব্দের মূলে ছিল লাতিন eloquentia—স্বতঃস্ফূর্ত, অনর্গল, আবেগ উদ্দীপনকারী দীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গি হল এলোকোয়েন্স। 'ওয়েলথ অফ নেশনস'-এর খ্যাতনামা লেখক অ্যাডাম স্মিথ আর জোসেফ প্রিস্টলি অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক বাক্‌সংস্কৃতিতে 'calm, composed, unpassionate serenity'-কে গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন। রোমান আমলের আবেগদীপ্ত উচ্চকণ্ঠ বাক্‌সংস্কৃতি আর নির্মীয়মাণ নব্য শমিত (polite) বাগ্‌ধারা—এই দুই আদর্শের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। উনিশ শতকে কলকাতায় পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণে যে-সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সেখানে বাগ্‌রীতির অনুশীলন হত। সেই চর্চায় এদেশীয় যুবারা অংশগ্রহণ করতেন—বক্তৃতা দেওয়া তাঁদের অবশ্যকৃত্য ছিল। 'Calcutta Monthly Journal'-এ ২৯ জানুয়ারি, ১৮২৭-এ হিন্দু কলেজ সম্বন্ধীয় একটি রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, পরীক্ষার পর ছাত্ররা শেক্সপীয়রের নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের অনুসরণে বক্তৃতা অভ্যাস করছে। অলঙ্কারের পরিভাষায় একে বলা হয় prosopopoeia, অতীত কোনও ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করে নিজের উপর সেই ব্যক্তির আরোপ ঘটিয়ে বক্তৃতা দেওয়া। সিসেরো এই রীতি অনুসরণ করতেন, হিন্দু কলেজের ছাত্ররাও করছেন। উনিশ শতকে বাঙালি ধর্ম-সংস্কারকরা বক্তৃতার গুরুত্ব টের পেয়েছিলেন। যেমন-তেমন বক্তৃতা হলে চলবে কেন? ওজস্বী উদ্দীপনাসঞ্চারী বক্তৃতায় জনসাধারণ মোহিত হতেন। ব্রাহ্মসমাজিদের মধ্যে অনেকেরই বক্তৃতার খুবই খ্যাতি ছিল। বাগ্মী কেশবচন্দ্র বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া রপ্ত করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে কথা ও গানের মাধ্যমে যে-উপাসনাপদ্ধতি চালু হয়েছিল তা পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের উপাসনার আদলে নির্মিত। এদেশে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের প্রভাব বেশ ছিল—এদেশীয়রা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলে যাজকি-উপাসনার পদ্ধতি মেনে চলতেন। রামকৃষ্ণদেবের কথনরীতি ও উপদেশ দানপদ্ধতি এই সমস্ত রীতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্য মহেন্দ্রনাথ দত্ত টের পেয়েছিলেন, অন্যরাও পেতেন। মহেন্দ্রনাথের বিবরণে থেমে থেমে কথা বলা রামকৃষ্ণদেব পাশ্চাত্য অর্থে বাগ্মী নন।

রামকৃষ্ণদেব নিজেও জানতেন তাঁর কথনরীতির স্বাতন্ত্র্য। তিনি মাঝে মাঝেই তাঁর শিক্ষিত ভক্তদের কলকাতার মানুষদের মতো তর্ক-বিতর্ক করতে বলতেন। সেই বিচার-তর্ক তিনি কৌতুকভরে দেখতেন। নরেন্দ্র আর গিরিশ তর্ক করছেন। অবতার প্রসঙ্গে তর্ক জমে উঠছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজি শব্দ, শব্দবন্ধ। ঠাকুর দেখেন আর ফুট কাটেন। তর্ক তো নয়, যেন কথার কুস্তি। ঠাকুর ফুট কাটলেন, ''নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে।'' সকলে হেসে উঠলেন। ঈশ্বরানুভব গৌণ—উকিলে-ডেপুটিতে তর্কই মুখ্য। লেকচার সম্বন্ধেও তাঁর বেশ তাচ্ছিল্য ছিল। কথামৃতের সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে সেকথা। ঠাকুর বলেছেন, ''কেশবের শিষ্য একজনকে সেদিন দেখলাম।... আবার শুনলাম লেকচার দেয়। নিজেকে কে শিক্ষা দেয় তার ঠিক নাই।'' লেকচার যেন নিতান্ত বাক্‌-কৌশল। লোককে নিজের পথে আনার উপায়। উপলব্ধির গভীরতা নেই, কথার ছলে সে লোক-ভোলানো। লোক-ভোলানো

কথায়, পরিশীলিত বাগ্‌ভঙ্গিতে রামকৃষ্ণদেবের আস্থা নেই। ভেতরটাই আসল—মহেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাকুরের তোতলামো, ভাষার গ্রাম্যতা, উচ্চারণের অশিষ্টতা অতিক্রম করে সেই ভেতর অবধি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর অবজ্ঞা শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছিল, অন্যদেরও তাই হত।

এখানে প্রসঙ্গত একটি কথা মনে রাখা দরকার। রামকৃষ্ণদেবের কথার স্বাতন্ত্র্য শ্রীম ছাড়া অন্যরাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭৮ সালে প্রকাশ করেন 'পরমহংসের উক্তি'। সুরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' দুভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম ভাগ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ঠাকুরের প্রয়াণের পরে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। রামচন্দ্র দত্ত প্রকাশ করেছিলেন দুটি গ্রন্থ—'তত্ত্বসার' (১৮৮৫) ও 'তত্ত্বপ্রকাশিকা'। তত্ত্বপ্রকাশিকা খণ্ডে খণ্ডে বের হয়েছিল। এই দুই বইতেই ঠাকুরের কথা সংকলিত। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সংকলন করেছিলেন 'পরমহংসের উক্তি এবং সংক্ষিপ্ত জীবন'। ১৮৮৭ সালে তা প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন সংকলিত 'পরমহংসদেবের উক্তি'র তৃতীয় ভাগ মুদ্রিত হল। শ্রীমর কথামৃত এই সমস্ত প্রয়াস-পরবর্তী। ১৯০২ থেকে শ্রীম-কথিত কথামৃত বাংলায় প্রকাশিত হতে শুরু করল। শ্রীমর বই কেবল ঠাকুরের কথার সংকলন নয়, এর মধ্যে ঠাকুরের কথা ছাড়াও আরও নানা স্তর চোখে পড়ে। শ্রীম ঠাকুরের কথা উদ্ধৃত করেছেন, যে-পরিবেশে তিনি সেকথা বলেছেন, সেই পরিবেশের কথা ছবি এঁকেছেন। আর যোগ করেছেন তাঁর ভাষ্য। এই ভাষ্য নানাভাবে ঠাকুরের কথার সঙ্গে অলংকারের মতো যুক্ত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় শ্রীম শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করেছেন। মূল বিবরণের আগে রয়েছে শাস্ত্রের উক্তি অথবা শ্লোক। এ যেন কথামৃতের পাঠকের কাছে গৌরচন্দ্রিকা। যেমন কথামৃতের প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদ শুরু হচ্ছে গীতার শ্লোকে। ঠাকুরের কথা শুনে মাস্টারমশাইয়ের গীতা মনে পড়েছে। ঠাকুরের কথার আগে তাই ভাষ্য হিসেবে গীতার শ্লোক যোজনা করলেন। এ-পদ্ধতি নতুন নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনার ক্ষেত্রেও একই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীম ইংরেজিশিক্ষিত বলে ভাষ্যযোজনা করতে গিয়ে অনেক সময় পাশ্চাত্য দর্শনের নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত রামকৃষ্ণদেবের কথার বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর উচ্চারণভঙ্গি ও শব্দব্যবহারের যে-ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা অবশ্য শ্রীম সর্বত্র রক্ষা করেছিলেন বলে মনে হয় না। ঠাকুরের শিক্ষিত শিষ্যরা অনেক সময়েই ভাবতেন মুখে অপশব্দ বসালে তাঁদের আচার্যকে অন্যরা ভুল বুঝতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'ম্যাক্সমুলার কৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ''ব্রাহ্মসমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি অলৌকিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট; আমরা যাহাকে অশ্লীল বলি, এমন কথার সমাবেশ তাহাতে থাকিলেও তাঁহার অপূর্ব্ব বালবৎ কামগন্ধহীনতার জন্য ঐ সকল শব্দ-প্রয়োগ দোষের না হইয়া ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে, অথচ ইহাই একটি প্রবল আক্ষেপ!''

রামকৃষ্ণদেবের মুখের কথার ভাষিক গ্রাম্যতা আধুনিক 'কলকাতা' কিছুতে হজম করতে পারছে না। নানাভাবে তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলছে। আসলে এ আধুনিকতার সংকট—বাংলা ভাষার কলকাতাকেন্দ্রিক প্রমিত রূপের সঙ্গে যা মেলে না সেই 'ভাষারূপ' নিয়ে সমস্যার শেষ নেই।

শ্রীম-র 'A Leaf from the Gospel of Sri Ramakrishna' নামের পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। এ কথামৃতের ইংরেজি

রূপ। অগ্রহায়ণ ১৩০৪-এ 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে লেখা হল, ''তিনি বাঙ্গালা ভাষা পরিত্যাগ করিলেন কেন? গভীর ভাবপূর্ণ তত্ত্বকথা ইংরেজিতে তর্জমা করিতে অনেক স্থলে ভাবান্তর হয়, তাহা তাঁহাকে বলিবার আবশ্যকতা নাই। এ দেশের সর্বসাধারণের পক্ষে তাহা দুর্বোধ্য হইয়া উঠিবে।" রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ইংরেজিতে রূপান্তরিত করলে বাংলা ভাষার শিষ্টতা-অশিষ্টতার প্রসঙ্গটি আর গুরুতর হয়ে ওঠে না। তবে তত্ত্বমঞ্জরী যে-কথাটি নির্দেশ করেছিল তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—দেশের সাধারণ মানুষ তো ইংরেজি গসপেল পড়তে-বুঝতে পারবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' নামের পত্রনিবন্ধে লিখেছিলেন, ''বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।" (নিম্নরেখা সংযোজিত) এই 'সাধারণ লোকের ভাষা' কলকাতার শিষ্টজনের ভাষা নয়। আবার সে-ভাষার প্রাকৃতরূপ কলকাতার ভদ্রলোকেরা পুরোটা হজমও করতে পারেন না। সুতরাং রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সংকলনগুলিতে কথার ভাবটি হয়তো বজায় থাকে, কথার রূপটি পুরোপুরি বজায় থাকে না। সুরেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি'র যে-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন তার কয়েকটি অংশ উদ্ধার করা যাক।

''সমুদ্রের জল পান না করিয়া, তন্মধ্যে লবণের অস্তিত্ব যেমন বলিতে পারা যায়, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, ব্রহ্মাণ্ডপতির অস্তিত্বও সেইরূপ নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে।...

''এক বক আস্তে আস্তে একটি মৎস্যের প্রতি ধাবিত হইতেছে, পশ্চাতে এক ব্যাধ সেই বকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু বক সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না। অবধৌত অবনত মস্তকে সেই বককে নমস্কার পূর্বক বলিলেন—'আমি যখন ধ্যানে বসিব তখন যেন ঐরূপ পশ্চাতে চাহিয়া দেখি না।' "

কথার ভাব যে রামকৃষ্ণদেবের সন্দেহ নেই কিন্তু কথার রূপ রামকৃষ্ণদেবের নয়। ১৮৯৭ সালে শ্রীম যখন ইংরেজিতে কথামৃতপূর্ব পুস্তিকা দুটি প্রকাশ করেন তখন বিবেকানন্দ খুবই খুশি হয়েছিলেন। দেরাদুন থেকে লেখা চিঠিতে দ্বিতীয় পুস্তিকাটির ভাষা-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy." ইংরেজিতে লেখা উপদেশের ভাষা সহজ, একমুখী, তবে বাংলায় লিখতে গেলেই প্রশ্ন উঠবে সে-ভাষা কতটা রামকৃষ্ণদেবের ভাষার অবিকল প্রতিলিপি? ভাব বজায় রেখে জায়গা বিশেষে ভাষা বজায় রেখেও শিষ্টতার আদল তৈরি হল, শ্রীম-র রামকৃষ্ণভাষ্য হয়ে উঠল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। এ অনিবার্য ছিল। তবে কথামৃতের মধ্য থেকে রামকৃষ্ণদেবের বাগ্‌বিধির রকম বোঝা যায়।

রামকৃষ্ণদেব প্রাগাধুনিক মরমিয়া সাধকদের ধারাকেই বহন করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবর্ষে রচিত পদ্যে লিখেছিলেন : ''বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা/ ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।" রামকৃষ্ণদেব কেবল নানা পথে সাধনাই করেননি, সাধকদের বাগ্‌রীতিকেও গ্রহণ করেছিলেন। কথামৃতে শ্রীম ঠাকুরের নানা সময়ে কলকাতা যাওয়ার কথা লিখেছেন। ব্রাহ্মদের উৎসবে ঠাকুর যোগ দিয়েছেন। নৃত্য-গান-কথায় মাতিয়ে তুলেছেন তাঁদের। উপাসনার যে-শিষ্টরূপ ব্রাহ্মরা প্রচলন করেছিলেন তার থেকে ঠাকুরের এই রীতি আলাদা। প্রাণময় এই রীতি চৈতন্যদেবের কথা মনে করিয়ে দেয়। কোনও কোনও ভক্ত তাঁকে উনিশ শতকের চৈতন্যদেব বলতেন। শ্রীম-র কথামৃতে এমন অনেক প্রকাশভঙ্গি আছে যা রামকৃষ্ণদেবের অননুকরণীয় ভাষাভঙ্গির ইঙ্গিতবাহী। এমন শব্দবন্ধ

সুরেশচন্দ্র দত্তের সংকলনে পাওয়া যাবে না। শ্রীম-র কথামৃত থেকে কয়েকটি প্রকাশভঙ্গি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 'যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ খচমচ করে', 'আমি নরুন দিয়ে ছেঁদা করতে লাগলাম', 'যাও গঙ্গা নাওগে, এঁকে তেল দে রে', 'কড়েরাঁড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে', 'নাচ কোঁদ বউমা, আমার হাতের আটকেল আছে'—উদাহরণ বিস্তৃত করে লাভ নেই। এর থেকে ঠাকুরের ভাষাভঙ্গির আন্দাজ পাওয়া যায়। তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না 'নব্যভারত', 'প্রদীপ', 'উদ্বোধন', 'তত্ত্বমঞ্জরী', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী' পত্রে যখন শ্রীম-র বাংলা কথামৃত প্রকাশিত হত তখন তিনি তাঁর বাংলা শর্টহ্যান্ডে লিখে রাখা ডায়রি থেকে নির্মাণ করতেন রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের ভাষ্য ও ছবি। ভক্তের হৃদয়ে যেভাবে ভগবান প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন এ তার ভাষ্যরূপ—অবিকল অনুকৃতি নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আর শ্রীম-র কথামৃত—দুই যে এক নয় তা নিয়ে নানা সময় নানা জন মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন, ''পরমহংসদেবের কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে। বহুকাল পূর্ব্বে পড়েছিলাম। মনে ধারণা হয়েছিল বানানো কথা আছে। কিন্তু সেটা আমার ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।" রবীন্দ্রনাথ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। এই সংশয় প্রকাশের কারণ ঠাকুরের কথার সঙ্গে শিষ্যের ভাষ্যের সংযুক্তি। কথামৃতের বয়ান কীভাবে শ্রীম-র ভাষ্য হয়ে উঠল সেই বিতর্কে প্রবেশ না করে এটুকু বলা যায়, আধুনিক বাক্‌সংস্কৃতির কলকাতার ধারাকে প্রাগাধুনিক পর্বের মরমিয়াদের বাক্‌সংস্কৃতি দিয়ে যিনি সমালোচনা করছিলেন তিনি রামকৃষ্ণদেব। সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কমলকুমারের রামকৃষ্ণ-ভক্তির কারণ কী? তাঁর লেখায় ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নানা সমালোচনা চোখে পড়ে। ভদ্রলোকের পরিকল্পিত আধুনিকতার সমালোচনা করে কমলকুমার ডুব দিতে চান প্রাগাধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ফল্গুধারায়। 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের গোড়ায় কমলকুমার লিখেছিলেন : ''এই গ্রন্থের ভাব বিগ্রহ রামকৃষ্ণের, ইহার কাব্য বিগ্রহ রামপ্রসাদের।... জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। এই উক্তির মধ্যে যাঁহার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত, যাঁহার স্মরণ মননে নব্য-বাঙলা সৃষ্ট; যিনি মানুষকে, প্রাকৃতজনকে, আপনার জাগ্রত অবস্থায় খানিক অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন—'মানুষ কি কম গা!' এই গল্প সেই গল্প, ঈশ্বর দর্শন যাত্রার গল্প।"

কমলকুমারের ভর রামকৃষ্ণদেব। আধুনিকতার ধারা ভক্তির প্রাগাধুনিক ধারাকে বিনষ্ট করতে পারেনি, রামকৃষ্ণদেবের মননে তা ফিরে এসেছে। সেই মনন ঠাকুরের নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গিতে প্রকাশিত। সেই বাগ্‌ভঙ্গির আদর্শ শিষ্যরা ধরে রাখতে পারেননি, ধরে রাখা সম্ভব নয়। ক্ষিতিমোহন সেন সাধক দাদূর বচন সংগ্রহ করেছিলেন। দাদূ বলেছিলেন মরমিয়া সাধকদের বাণী ও জীবন মশালের আগুনের মতো। সেই আগুনকে পরবর্তী কালে ধরে রাখা যায় না। ধরে রাখতে গেলে যা পড়ে থাকে তা মশালের ন্যাকড়া আর কাঠ। পরবর্তী কালের সাধকেরা আবার নতুন করে নিজের মতো যদি উপলব্ধি করেন সত্যকে, তবেই দীপ্তিময় হয়ে উঠবেন তাঁরা। রামকৃষ্ণদেবের 'কথা'র ইশারা সেই উপলব্ধির পথে এগিয়ে দিতে পারে। পাশ্চাত্য আধুনিকের বাগ্‌ধারার বিপরীতে সেদিনের কলকাতাকে নিজের বাগ্‌ধারায় মরমিয়া রামকৃষ্ণদেব সেই পরমের ইশারাই দিতে চেয়েছিলেন। সেই বাগ্‌ধারায় মিশেছিল লোকজ্ঞান, পর্যবেক্ষণশক্তি, বিস্ময়কর লোকায়ত ও প্রাকৃতিক উপমা।